Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-IV, July 2026, Page No. 37-49
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.04W.115

সাম্প্রতিক ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে উপনিবেশ পূর্ব বাংলার লৈঙ্গিক ইতিহাস

পরমাশ্রী দাশগুপ্ত, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*
অরিজিৎ পাল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 15.06.2026; Accepted: 04.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The study of history is a dynamic and ever-evolving process, continually reshaped by new inquiries and perspectives that deepen our understanding of the past. From the 1970s onward, the study of gender history gained significant prominence, with women's history and culture emerging as important fields of research. Scholars increasingly explored how the social, cultural, and political constructions of masculinity and femininity influenced historical processes, thereby establishing gender as a vital category of historical analysis. In Bengali literature, a gender-oriented perspective began to take shape during the latter half of the twentieth century. Subsequently, in the twenty-first century, gender emerged as an even more significant theme in historical novels centered on the history of Bengal. This essay explores the representation of gender in selected historical novels based on Bengal's past.

Keywords: Gender, Woman, History, Novel, Bengal

ইতিহাস সবসময়ই পুনর্বিবেচনা এবং নতুন করে নির্মাণের ক্ষেত্র।

> ...it opens the way for multiple standpoints. Because the past cannot be definitely reclaimed or reconstructed, and the past's totality is irrecoverable, our access to understanding will necessarily remain... provisional.[১]

বিশ শতকের শেষের দিকে এসে পূর্ববর্তী ইতিহাসচর্চা নানা রকম প্রশ্নের মুখে দাঁড়ায়। নতুন অনুসন্ধান ও ভাবনা ইতিহাসকে ভেঙে আবার গড়ে তোলে। লৈঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসকে পুনর্কথনের দিকে নিয়ে যায়। ইতিহাসের পুনর্কথন অনেক ক্ষেত্রে আখ্যান নির্ভর। নানা মাধ্যমে এই পুনর্ব্যাখ্যা চলতে পারে। ছবিতে, চলচ্চিত্রে, সাহিত্যে 're-telling' অতীতকে ভাঙে আবার গড়েও তোলে। উপনিবেশ পূর্ববর্তী বঙ্গদেশের ইতিহাসের যে লৈঙ্গিক অভিমুখ আছে তা এই পুনর্কথনের মধ্যে দিয়ে উঠে আসতে পারে। সাম্প্রতিক ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস হল এই ধরনের 'পুনর্কথন', যেখানে ইতিহাস ঐতিহাসিকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথিত অর্থাৎ অতীতের মাত্রার সঙ্গে সেখানে সংযুক্ত হয়েছে একটি ভিন্ন কালের মাত্রা, ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায়, তাঁর নিজস্ব চেতনাবোধ ও সংস্কৃতি। বহুমাত্রার সংযোগে ইতিহাস হয়ে উঠতে পেরেছে অনন্ত সম্ভাবনার ক্ষেত্র। আখ্যানের মধ্যে ইতিহাসের সম্ভাবনাগুলো কীভাবে নিহিত থাকে, সেই অনুসন্ধানের পথে এগিয়ে উপনিবেশ পূর্ব বঙ্গদেশের লৈঙ্গিক ইতিহাস নির্মাণ।

বিগত শতকের সাতের দশক থেকে লৈঙ্গিক ইতিহাসচর্চা জনপ্রিয় হতে থাকে। পৌরুষত্ব ও নারীত্বের সামাজিক, সাংস্কৃতি ও রাজনৈতিক নির্মাণ কীভাবে আমাদের অতীতকে গঠন করেছিল তার অনুসন্ধান চলতে থাকে। ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই সামাজিক লিঙ্গ বা 'gender' একটা বিশেষ মাত্রা হয়ে দাঁড়ায়। বিশ শতকের দুই-তিনের দশক থেকেই প্রগতিশীল ইতিহাসবিদ ও মার্কসীয় ভাবধারা ঐতিহ্যগত ক্ষমতার বিন্যাসকে (power structure) প্রশ্ন করতে থাকে। এই ভাবধারাই পরবর্তীকালে লৈঙ্গিক ইতিহাসচর্চার পথ দেখায়। এই বিশেষ চর্চাটি অন্তঃশৃঙ্খলামূলক, যেখানে 'হিস্ট্রি' ও 'জেন্ডার স্টাডিস' সম্মিলিতভাবে এক নতুন শৃঙ্খলা তৈরি করে।

আমেরিকান ইতিহাসে নারী পরিসর চর্চায় এসেছিল বিশ শতকের সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। নারী-ইতিহাস, নারীর সংস্কৃতি আলাদা গুরুত্ব নিয়ে উঠে আসতে থাকে। তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবদমন ও অত্যাচারের কারণ ও প্রকৃতি যেমন অন্বেষণ করেছেন, তার সঙ্গে গুরুত্ব দিয়েছে ইতিহাস ও নারীর আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টিকে। ব্রিটেনে নারীর ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রটিকে প্রভাবিত করেছিল নানা নারীবাদী আন্দোলন ও মার্কসিজম্ প্রভাবিত সামাজিক ও শ্রমের ইতিহাস।

ইতিহাসে মহিলাদের অবস্থান ও ক্রিয়াকলাপকে লিঙ্গ বিভাজন ও শ্রেণিবিভাজন কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তার আলোচনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। 'জেণ্ডার' বা সামাজিক লিঙ্গ প্রকৃতপক্ষে এক বিষম ক্ষমতা সম্পর্কের কথা বলে। এই দিকটি ইতিহাসকে ও ইতিহাসচর্চাকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে করেন Joan Scott. ফ্রান্সের উত্তর গঠনবাদীদের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নানা রকম ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে লৈঙ্গিক ভাষা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন Joan Scott. পরবর্তীকালে এই চর্চা আরও বহুদূর এগিয়ে যায়।

এক

ঐতিহাসিকদের মতে ঔপন্যাসিকরা অতীতকে নতুন করে নির্মাণ করেন। অতীত তাদের দ্বারা পুনর্নির্মিত হয়। ঔপন্যাসিকেরা যে সমস্ত প্রশ্ন তোলেন এবং সেই প্রশ্নগুলোর যেভাবে উত্তর তৈরি করেন তার মধ্যে দিয়েই আমরা পুনর্নির্মিত ইতিহাসকে জানতে পারি। কিন্তু এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক নিজেও ইতিহাসের বাইরে থাকেন না। ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক আদর্শ, সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবেশ যার মধ্যে তিনি কাজ করে চলেছেন সেটাও ইতিহাসকে গড়ে তোলে। লৈঙ্গিক ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পর্যালোচনার এক বিশেষ তাৎপর্য আছে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলা উপন্যাসে লৈঙ্গিক অভিমুখের পরিসর তৈরি হচ্ছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাধা' (১৯৫৮) উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে বাংলার বৈষ্ণব নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের সহজিয়া সাধনার প্রসঙ্গ। সহজিয়া সাধনায় মেয়েদের ভূমিকা, তাদের ইচ্ছা, ব্যতিক্রমী জীবন, সেই জীবনের বঞ্চনা, হতাশা, প্রাপ্তি ও নিষ্পেষণ ইতিহাসের পটভূমিতে লেখক নির্মাণ করেছেন। তারাশঙ্করের অন্য একটি উপন্যাস 'গন্নাবেগম' (১৯৬৫) এ বর্ণিত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ গজল রচয়িতা আলি কুইলি খানের কন্যা গন্নার কাহিনি, যাকে ভাগ্যের পরিহাসে একজন বিদুষী নারী থেকে পরিণত হতে হয়েছিল জারিয়া বা বাঁদীতে। রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া ঐতিহাসিক চরিত্র গন্নাকে নিয়ে রচিত এ উপন্যাসেও উঠে এসেছে লৈঙ্গিক প্রসঙ্গ।

সাম্প্রতিক কালের বঙ্গদেশের ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাসে লৈঙ্গিক ইতিহাস নির্মাণের পথরেখা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। উপনিবেশ পূর্ব বঙ্গদেশের পটভূমিকেন্দ্রিক যে উপন্যাসগুলি আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করব, তার মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে হরিশংকর জলদাস রচিত 'মোহনা' (২০১৩) উপন্যাসটির

কথা। বঙ্গদেশে যে সময় পাল রাজারা রাজত্ব করছিলেন, সেই সময়ের এক অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল কৈবর্ত বিদ্রোহ। পাল সম্রাট দ্বিতীয় মহীপালের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বরেন্দ্রভূমির কৈবর্তরা দিব্যোক ও ভীমের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কৈবর্তদের এই বিদ্রোহের ফলস্বরূপ দ্বিতীয় মহীপাল পরাজিত ও নিহত হন এবং পাল সাম্রাজ্যের প্রাথমিক পর্যায়ের শাসনের অবসান ঘটে। বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় কৈবর্ত শাসন। প্রায় সাঁইত্রিশ বছর বঙ্গদেশে কৈবর্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তী সময়ে রামপাল তাঁর মামা মথনদেবের সহযোগিতায় বিভিন্ন অঞ্চলের সামন্তদের একত্রিত করেন এবং ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভীমকে পরাজিত করেন। রামপাল ও মথনদেবের হাত ধরেই বাংলায় পাল সাম্রাজ্যের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ‘মোহনা’উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে এই সময়কাল। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র কৈবর্ত সেনাপতি চণ্ডক ও বারাঙ্গনা নারী মোহনা। ছেলেবেলায় ‘পাগলির বেটা’ বলে পরিচিত দুই-আড়াই বছরের শিশু চণ্ডককে ভীম রাস্তা থেকে তুলে এনে নিজের প্রাসাদে স্থান দিয়েছিলেন এবং পিতৃস্নেহে মানুষ করে তুলেছিলেন। ‘চণ্ডক’ শব্দের অর্থ ‘ভয়ংকর’, নাম ও কর্মের সামঞ্জস্য রাখার জন্য ভীম তাকে কৈবর্তদের বিপক্ষের শত্রুদলের মোকাবিলা করার জন্য অস্ত্রশিক্ষা দেন এবং তাকে প্রায় অপ্রতিরোধ্য হিসাবে গড়ে তোলেন। ক্রমশ সে হয়ে ওঠে কৈবর্ত রাজত্বের সেনাপতি। কিন্তু তাঁর হৃদয় জয় করে কালিন্দী নদীর তীরের বারাঙ্গনাপল্লীতে বসবাসকারী মোহনা। মোহনার সঙ্গে অধিক সময় যাপন করতে পছন্দ করত চণ্ডক।

কৈবর্ত সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও নানা কারণে চণ্ডকের মনের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল ভীম ও তাঁর পরিবারের প্রতি ক্ষোভ, বেদনা ও মনক্ষুণ্ণতা। তার বারবার করেই মনে হতে থাকে, সে ‘সরাসরি’ এই পরিবারের অংশ নয়, সে বাইরের লোক, ভীমের সঙ্গে তার কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। যদিও ভীমের তরফ থেকে চণ্ডককে ভালোবাসার কোনও ত্রুটিছিল না। কিন্তু চণ্ডকের মনে এই ক্ষোভ আরও বদ্ধমূল হয়, যখন ভীমের জ্যেষ্ঠপুত্র শর্বের বিবাহ উপলক্ষ্যে দেবলা চণ্ডককে বাদ দিয়ে শর্বকে তাদের জ্যেষ্ঠপুত্রের স্বীকৃতি দেন। চণ্ডকের মনে এভাবেই ভীম ও তার পরিবারের প্রতি ক্ষোভ বাড়ছে থাকে। ভীম তা অনুধাবনও করতে পারেন এবং চণ্ডককে তিনি নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। চণ্ডক তার মানসিক যন্ত্রণা ও হতাশা উজাড় করে দিতে চায় মোহনার কাছে, মোহনার নরম শরীরের স্পর্শে সে দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করে। মোহনার বিনোদনের জন্য চণ্ডক অর্থমন্ত্রী বিল্বমঙ্গলের কাছে বজরা তৈরির পঞ্চাশ পণ কপর্দক চাইলে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিল্বমঙ্গল তা দিতে রাজি হন না। এতে চণ্ডক প্রবল অপমানিত বোধ করে এবং পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে রামপাল ও মথনদেব যখন ভীমের বিরুদ্ধে সামন্তরাজাদের একজোট করছিলেন, সে সময় তাদের কাছে চণ্ডকের এই আচরণের খবর পৌঁছোলে কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন মথনদেব ভীম ও চণ্ডকের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেন। অমোঘবর্ষী নামক এক ছদ্মবেশী গুপ্তচর চণ্ডকের কাছে গিয়ে তাকে রামপালের সেনাপ্রধান হওয়ার পরামর্শ দিলে চণ্ডক সেই লোভ সামলাতে পারে না। গোপনে রামপালের শিবিরে বৈঠক হয় চণ্ডক ও রামপালের। সেই বৈঠকের বিবরণ ঔপন্যাসিক দেননি। পরদিন যুদ্ধে ভীমের রণহস্তী হিমালয়ের চোখে খড়্গ ঢুকিয়ে দেয় চণ্ডক, উন্মত্ত হস্তী ভীমকে নিয়ে পাল সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করলে ভীম বন্দি হন। রামপালের নির্দেশে তার পুত্র বিত্তপাল ভীমের সকল পুত্রকে একে একে হত্যা করে এবং শেষে ভীমকে হত্যা করে। দীর্ঘদিন ধরে নিজের ওপর হওয়া অন্যায়-অবিচারের প্রতিশোধ নিয়ে তৃপ্ত চণ্ডক পাল সাম্রাজ্যের সেনাপ্রধান হওয়ার খুশিতে বারাঙ্গনাপল্লিতে তার প্রিয় মোহনার কাছে যায়।

মোহনা ছিল চণ্ডকের একমাত্র অবলম্বন, মোহনাকে ব্যতীত চণ্ডকের জগৎ ছিল শূন্য। মোহনাকে নবরত্ন হার পরানোর জন্য, মোহনার বিনোদনের বজরা তৈরির জন্য বারংবার কৈবর্ত রাজপ্রাসাদের সকলের সঙ্গে,

এমনকি ভীমের সঙ্গেও চণ্ডকের মতবিরোধ হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে চণ্ডকের কৃতঘ্নতার 'উপহারস্বরূপ' মোহনা দেহোপজীবিনীদের অমরত্বের প্রতীক, তার জড় পতিবর বঁটির আঘাতে চণ্ডককে হত্যা করে। এখানেই উপন্যাসটি হয়ে ওঠে একটি ঐতিহাসিক 'থ্রিলার', যার সমাপ্তি অংশটি পাঠকের চেতনাকে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় লৈঙ্গিক মাত্রা। চণ্ডক মোহনার কাছে হয়ে ওঠে যুগপৎ 'ভালোবাসার' ও 'ঘৃণার'। চণ্ডকহন্তা মোহনার অট্টহাসি পাঠকের হৃদয়কে উদ্বেল করে তোলে-

> পেছন থেকে চণ্ডকের কানে ভেসে এল মোহনার কণ্ঠ, 'তোর আসল পুরস্কারটা নিয়ে যা রে, চণ্ডক। তোরে এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য আমি পালিয়ে যাই নাই। অধীর আগ্রহে তোর জন্য প্রতীক্ষা করেছি।'
>
> চমকে পেছন ফিরল চণ্ডক। বিহ্বল-বিস্ফারিত চোখে দেখল, মোহনার প্রচণ্ড ঘৃণা মেশানো চোখ থেকে আগুন ঝরছে।
>
> 'মোহনা, কী করছ, কী করছ, মোহনা?' বলতে চাইল চণ্ডক।
>
> তার আগেই চণ্ডকের মস্তক বরাবর মোহনার হাতের বঁটিটি নেমে এল। ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল মোহনার ভালোবাসার চণ্ডক, মোহনার ঘৃণার চণ্ডকে।
>
> উন্মাদিনীর মতো মোহনা হেসে উঠল-খিল খিল খিল খিল।[২]

কৈবর্ত বিদ্রোহ প্রাগাধুনিক যুগের বঙ্গদেশের এক অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে অনেকগুলি উপন্যাস রচিত হয়েছে, যেমন-অনুরূপা দেবীর 'ত্রিবেণী', সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত', মহাশ্বেতা দেবীর 'কৈবর্তখণ্ড' ইত্যাদি। কিন্তু 'মোহনা' উপন্যাসটি অন্যান্য উপন্যাসগুলির থেকে স্বতন্ত্র এবং অভিনব। এর অন্যতম কারণ, ঔপন্যাসিক হরিশংকর জলদাস এখানে মোহনার মত এক কাল্পনিক বারাঙ্গনা নারীকে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র হিসাবে গড়ে তুলেছেন, যে চণ্ডকের বিশ্বাসঘাতকতার চরমতম প্রতিশোধ নিয়েছে। প্রাচীন গৌড় স্বল্প পরিমাণে হলেও উত্তর ভারতের সদাগরী ধনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে এখানকার অধিবাসীরা উত্তর ভারতীয় নাগর সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং এর সঙ্গে বাৎস্যানীয় নাগরাদর্শের প্রভাবও দেখা যায়।[৩] এর ফলে সেই সময় থেকেই গৌড়ের বিত্তশালী অধিবাসীরা বিলাসব্যসনে মত্ত হয়ে ওঠেন। নগরের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে বারাঙ্গনাপল্লি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বারাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা দেওয়া এবং বার্ধক্যকালীন ভাতা দেওয়ার উল্লেখ আছে। বোঝা যায়, ভারতীয় নগর জীবন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে বারাঙ্গনাদের অস্তিত্ব বহুদিন থেকেই সংযুক্ত ছিল। 'নগরের নটী'-র প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও। সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মিলে যায় হরিশংকর জলদাসের 'মোহনা' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে। সেলিনা হোসেনও বুদ্ধমিত্র ও দেবল ভদ্রের বারাঙ্গনা বিলাসের কথা উল্লেখ করেন। হরিশংকর জলদাস এ উপন্যাসে দেখিয়েছেন প্রাচীন বঙ্গদেশের বারাঙ্গনাপল্লির এক জীবন্ত চিত্র-

> "রাতে-দিনে অতিথি আসে বারাঙ্গনাগৃহে। পুরুষের শরীরক্ষুধার কোনো রাত-দিন নেই, সকাল-সন্ধ্যা নেই, বর্ষা-হেমন্ত নেই। শরীর চঞ্চল হলে তাদের নারীদেহ চাই-ই চাই; নরম রসে ভরা নারীশরীর। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে চাই রূপ-সৌষ্ঠবময়। চাই পুরুষহৃদয় নাচিয়ে দেওয়ার মতো কটাক্ষ, কূলপ্লাবী সুগহিন অন্ধকার গহ্বর।"[৪]

বারাঙ্গনা গৃহের এই পরিচয় লিঙ্গ পরিসর নির্মাণ করে ঠিকই, কিন্তু এটাই সম্পূর্ণ কথা নয়। উপন্যাসটির বিশেষত্ব এখানেই যে, বারাঙ্গনা মোহনা শুধু ভোগ্যপণ্য হিসাবেই চিহ্নিত নয়। মোহনার জীবনকে দেখার এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ এখানে বর্ণিত। সাব অল্টার্ন এক নারীর জীবনবোধ ও সততার দিকে উপন্যাসের অভিমুখ

ঘুরিয়ে একটি অবদমিত শ্রেণির ইতিহাসকে ভিন্নভাবে নির্মাণের চেষ্টা করলেন ঔপন্যাসিক। হরিশংকর জলদাস নিজেও একজন নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের মানুষ, ফলে তিনি নিপুণভাবে এ বিষয়টি দেখাতে পেরেছেন। এ উপন্যাসে উঠে এসেছে সামাজিক পরিচয় ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে নারীর বন্ধনমুক্তির কাহিনি। মোহনা পেশাগতভাবে একজন বারাঙ্গনা। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় বারাঙ্গনাদের নৈতিক দিক থেকে স্খলিত হিসাবেই দেখা হয়। কিন্তু বারাঙ্গনা মোহনার নৈতিকতাবোধ, আদর্শবোধের পরিচয় আমরা এখানে দেখতে পাই, যেখানে সে চণ্ডককে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না, কারণ চণ্ডকের একমাত্র পরিচয় সে 'বিশ্বাসঘাতক'। আর এভাবেই 'মোহনা' উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে আখ্যানের মধ্যে দিয়ে লৈঙ্গিক ইতিহাস নির্মাণের এক অন্যতম দৃষ্টান্ত।

দুই

পাল রাজাদের রাজত্বকালের পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশে সেন রাজারা রাজত্ব করতে শুরু করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট প্রদেশের অধিবাসী সামন্ত সেন ও তাঁর পুত্র হেমন্ত সেনের উদ্যোগে বাংলায় সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন আমলের বাংলায় নানা শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক-সামাজিক সংস্কার ঘটলেও নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, বহিরাগত সেন রাজাদের সঙ্গে বাংলার লোকজীবনের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি।[৫] সেন রাজত্বের মাঝামাঝি সময় থেকেই বঙ্গদেশে শাসনতান্ত্রিক অবক্ষয় এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলায় তুর্কি আক্রমণের পূর্বে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে এ বিষয়গুলি আরো তীব্র হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গদেশে সেন রাজত্বের পটভূমিতে যে উপন্যাসগুলি রচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকরা সেন রাজত্বের অবক্ষয়ের মূল কারণগুলিকে অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। এগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক সৌম্য ভট্টাচার্য 'গৌড়গোধূলি' (২০১৩) উপন্যাসে এবং দেবকুমার সোম 'অষ্টাদশ অশ্বারোহী' উপন্যাসে (২০১৮) সেন রাজবংশের পতনের জন্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংকটের পাশাপাশি যে কারণটি দাবি করেছেন, তা হল সেই সময়ে রাজ অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিদের যথেচ্ছাচার এবং এ বিষয়ে শাসকের উদাসীনতা। এ প্রসঙ্গে তাঁরা দুজনেই উল্লেখ করেছেন লক্ষ্মণ সেনের শ্যালক তথা লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী বল্লভার ভাই কুমারদত্ত কর্তৃক এক সাধারণ নারী মাধবীর শ্লীলতাহানির প্রসঙ্গ, যা সেন আমলের শাসনতান্ত্রিক অবক্ষয়ের এক অন্যতম দৃষ্টান্ত। হলায়ুধ মিশ্রের 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এ ঘটনার বিবরণ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এক সাধারণ বণিকবধূ মাধবী লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় ক্রন্দন করতে করতে এসে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে। সে জানায়, রাজশ্যালক কুমারদত্ত জোরপূর্বক তার বাড়িতে প্রবেশ করে তার শ্লীলতাহানি করেছে-

> ....(২) 'বণিকবধূ মাধবীনাম্নহম্ রাজশ্যালকোহয়ং কুমারদত্তো মম গৃহং বলাৎ (৩) প্রবিশ্য বস্ত্রং বিধৃত্য স্তনমর্দ্দনং কৃতম। তত আরাবং কুর্ব্বন্ত্যাং ময়ি মম গৃহং জনাঃ তূর্ণং আয়াতাঃ। তৈর্ব্বদ্ধোহসৌ কামান্ধঃ শ্যালকঃ শ্রীমতামিতি। অত্র যথোচিতে দণ্ডে শ্রীমন্তঃ প্রমাণমিতি'। ইত্যুক্তে সতি রাজমহিষী বল্লভা-নামা চেটিকাভি (৪) রুক্তা তত্রাজগাম। আগত্য দ্বারমালিঙ্গা মন্ত্রিণমুমাপতিধরং ভ্রাতুর্ব্বিরোধিনমুদ্দিশ্য জগাদ। 'হে সভাসদাঃ, পাপিষ্ঠহসাবুমাতিধরঃ। তস্যৈব এষা কৃত্যা (৫) ইতি বিজ্ঞায় যৎকর্ত্তব্যং তদ্বিধীয়তাম্।' রাজ্ঞ্যা ইতি শ্রুত্বা মন্ত্রী মৌনং আলম্ব্য, তথৈব রাজ্ঞাপি তথৈব সভাসদশ্চ।'[৬]

মাধবী ছিলেন এক সাধারণ বণিকবধূ। সে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় এসেছিল তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের বিচার চাইতে। তার বিশ্বাস ছিল, রাজা লক্ষ্মণ সেন নিশ্চয়ই এ ঘটনার ন্যায়বিচার করবেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটে সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা। লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী বল্লভা সে সময় রাজসভায় এসে নিজ ভ্রাতা

কুমারদত্তকে বাঁচানোর জন্য গোটা বিষয়টিকে 'কুমারদত্ত বিরোধী চক্রান্ত' বলে লঘু করে দিতে চান এবং মাধবী সম্পর্কে হীন বাক্য প্রয়োগ করে তার কেশাকর্ষণ করে রাজসভা থেকে তাকে বিতাড়িত করতে উদ্যত হন। লক্ষ্মণ সেন ও তাঁর সভাসদেরা এ পর্যায়ে কার্যত মৌন ও নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকেন। ন্যায়বিচারের আশায় রাজসভায় আসা মাধবীর সম্মান সেদিন কার্যত ভূলুণ্ঠিত হয়।

সৌম্য ভট্টাচার্য এবং দেবকুমার সোম, দুজনেই তাঁদের উপন্যাসে মাধবীর প্রসঙ্গকে 'সেকশুভোদয়া'-র কাহিনি অনুসারেই উল্লেখ করেছেন। 'গৌড়গোধূলি'-তে মাধবীকে দেখানো হয়েছে বণিক চারুদত্তের স্ত্রী হিসাবে, যে মহারানি বল্লভার তাম্বুলকর হিসাবে কাজ করার সময় রাজশ্যালক কুমারদত্ত তাকে কুপ্রস্তাব দেয়। মাধবী রাজদরবারে গিয়ে রাজানুগ্রহ প্রার্থনা করলেও লক্ষ্মণ সেন নীরব শ্রোতা হয়ে থাকেন, বিষয়টির কোনো প্রতিকার করেননি। অন্যদিকে 'অষ্টাদশ অশ্বারোহী' উপন্যাসে মাধবী চিত্রিত হয়েছে মধুসূদন বেনে নামক এক বণিকের পুত্রবধূ হিসাবে। এই উপন্যাস অনুসারে, রাজশক্তির সঙ্গে মধুসূদন বেনের সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং এ বিরোধিতা চরমে ওঠে, যখন কুমারদত্ত কৌশল করে মধুসূদন ও তার পুত্র মধুকর বেনেকে গ্রেফতার করিয়ে তাদের বাড়িতে ঢুকে মাধবীর শ্লীলতাহানি করতে যান। পরবর্তীতে কুমারদত্তের শাস্তির দাবিতে বণিকেরা একত্রিত হয়ে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় গেলেও মাধবী ন্যায়বিচার পায় না।

একজন নির্যাতিতা নারীকে সঠিক বিচার দিতে না পারা শাসনতন্ত্রের ব্যর্থতা ও অবক্ষয়ের দিকটিকেই চিহ্নিত করে। একইসঙ্গে এ ঘটনা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোটিকেও আমাদের সামনে তুলে ধরে। প্রাচীন যুগ থেকে এই সময় পর্যন্ত আমাদের সমাজে একদিকে রয়েছে বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণি এবং অন্যদিকে রয়েছে অনভিজাত সাধারণ মানুষেরা। কুমারদত্ত কর্তৃক মাধবীর শ্লীলতাহানির ঘটনাটিকে প্রাচীন যুগের রাজানুগ্রহপুষ্ট অভিজাত শ্রেণির মানুষের অনভিজাত সাধারণ নারীদের ওপর শোষণের দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। এর পাশাপাশি আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তা হল রাজমহিষী বল্লভার আচরণ। বল্লভা ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের বৃদ্ধ বয়সের পত্নী। রজনীকান্ত সেন তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন-

> বল্লভা অত্যন্ত প্রগলভা ছিলেন,-এমনকি তিনি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে রাজকার্যের ব্যাঘাত জন্মাইতেন, রাজা ভয়ে কোনো কথা বলিতেন না।[৭]

এখান থেকে বোঝা যায়, রাজসভায় লক্ষ্মণ সেনের কার্যকলাপের ওপর বল্লভা প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বল্লভার এই প্রবল প্রতিপত্তির কারণে মাধবী তার ন্যায়বিচার পায়নি। নিজের ভাইকে নির্দোষ প্রমাণ করতে বল্লভা মাধবীর চরিত্রের ওপর কলঙ্কলেপন করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। বল্লভা এখানে বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে। ফলে নারীর মধ্যেও বেরিয়ে এসেছে পুরুষতান্ত্রিক স্বর। নির্যাতিতা নারী মাধবীর প্রতি বল্লভার এ অবিচার তার পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকেই চিহ্নিত করে। ক্ষমতাপুষ্ট নারীর মধ্যে লিঙ্গ ক্ষমতার স্বর মাঝে মাঝেই তীব্র হয়ে ওঠে। মাধবী তার দৃষ্টান্ত। একইসঙ্গে রাজানুগ্রহপুষ্ট শাসক শ্রেণির প্রতিনিধির সাধারণ নারীর ওপর অত্যাচার এবং শাসনতন্ত্রের উদাসীনতা ও ন্যায়বিচার দিতে না পারা এক বিশেষ সময় ও সমাজকে চিনিয়ে দেয়। সেখানে মাধবীর মত অসংখ্য নির্যাতিতা নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা নিষ্পেষিত হয়ে হাহাকার করে বলে ওঠে-

> যে সমাজ রমণীর দেহটাই চেনে শুধু, হৃদয় চেনে না
> সেখানে বাঁচতেও ঘৃণা হয়! আমি এতকাল ভেবেছি
> আমার কত কিছু আছে, এই আকাশের নীল আলো,
> নদীর সঙ্গীত

বৃষ্টিস্নাত দিনের সুষমা, অসীম নক্ষত্রলোক, বৃক্ষছায়া...
হঠাৎ বুঝেছি আজ পুরুষের কাম-প্রেম-আদেশ বা
স্তুতি
এর চেয়ে আর কিছু প্রাপ্য নেই নারীর জীবনে![৮]

তিন

মৈমনসিংহের কবি চন্দ্রাবতীর জীবন নিয়ে কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ রচনা করেছিলেন 'চন্দ্রাবতীর পালা'। যে পালা পূর্ববঙ্গের পালাকারদের মুখে মুখে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল। এই পালায় মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর শৈশব জীবন, তার প্রেম, প্রেমিক জয়ানন্দের প্রবঞ্চনা, চন্দ্রাবতীর বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত, রামায়ণ লেখার সংকল্প, জয়ানন্দের নিজের ভুল বুঝতে পেরে চন্দ্রাবতীর কাছে প্রত্যাবর্তন, চন্দ্রাবতীর জয়ানন্দকে গ্রহণ না করা এবং শেষ পর্যন্ত জয়ানন্দের আত্মহত্যা-এই সম্পূর্ণ কাহিনি বিবৃত হয়েছে গীতিকার নিজস্ব স্টাইলে। মৈমনসিংহ গীতিকার 'দস্যু কেনারামের পালা', 'মলুয়া' পালার কবি হিসেবে এই চন্দ্রাবতী পরিচিত। চন্দ্রাবতীর লেখার রামায়ণও মহিলা সমাজে প্রচলিত, যেখানে সীতার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ পালাটি বর্ণিত। 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক চন্দ্রকুমার দে প্রথমে মৈমনসিংহ অঞ্চল থেকে চন্দ্রাবতীর জীবন কাহিনি সম্বলিত পালাটি সংগ্রহ করেন। এই পালাটি প্রকাশ করেন দীনেশচন্দ্র সেন। সংগ্রাহক ও সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকও তাঁর বইয়ে পালাটিকে রেখেছিলেন। চন্দ্রাবতীর জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে বিদ্যায়তনিক চর্চার ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয়েছিল নবনীতা দেবসেনের বক্তব্য ও লেখায়। তিনি সারা ভারতে মহিলাদের কণ্ঠে ও নারী সমাজে প্রচলিত রামায়ণের সঙ্গে চন্দ্রাবতী বিরচিত রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনায় জায়গাটা প্রস্তুত করেন। অন্যদিকে সৃষ্টিশীল কলমে চন্দ্রাবতীর জীবন ও রামায়ণকে 'বামাবোধিনী' (১৯৯৭) উপন্যাসে নিয়ে আসেন। চন্দ্রাবতীর উপলব্ধিকে তিনি সর্বভারতীয় স্ত্রী চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। চন্দ্রাবতীর সম্ভাবনাময় জীবন নিয়ে ২০২৩ সালে উপন্যাস লিখলেন তৃষ্ণা বসাক। সেই সময়ের এক প্রথাবিরোধী নারী চন্দ্রাবতী। লেখাপড়ায় যার আগ্রহ, প্রবল যার মনের জোর। সমাজ নির্ধারিত আদর্শায়িত লিঙ্গ ভূমিকায় যাকে মেলানো যায় না। চন্দ্রাবতীর জীবন ইতিহাসকে নতুন সময়ে গড়ে তুললেন তৃষ্ণা বসাক। নারীর বিদ্যাচর্চা যে সময় নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল, সেই সময়ে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী চন্দ্রাবতী চরিত্র কে গড়ে তোলা হল-

> সুলোচনা বাসিপাট সেরে নদীর দিকে যেতে যেতে একটু থমকে দাঁড়িয়ে গেল। স্বামী সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পুঁথি নিয়ে বসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েও উঠেছে। বাবার পুঁথি রচনা কাছে বসে দেখে সে নিবিষ্ট মনে।[৯]

বাবা দ্বিজ বংশীদাসের পুঁথি রচনা দেখতে দেখতে চন্দ্রাবতীর মনে লেখাপড়ার জন্য অদম্য আগ্রহ তৈরি হয়। ফুলেশ্বরী নদীর ধারে পাঠবাড়ি গ্রামের মেয়ে চন্দা। বংশীদাসের লেখার কালি তৈরি করে, ফুল তুলতে যায়, নদীর ঘাটে বসে থাকে আর 'আখর' তৈরি করে। চন্দার মা সুলোচনার মত সেই সময় অনেকেই ভাবতো 'মেয়েদের লেখাপড়া, আপনা হতে ডুবে মরা।'[১০] তবুও সে ভাবে লিখবে কারণ মলুয়ার দুঃখ কোনো পুরুষ তার থেকে বেশি অনুভব করবে না। চন্দা 'জেণ্ডার স্টিরিওটাইপ' ভাঙা এক চরিত্র। ঘরের কাজ সে করে, কিন্তু সে কাজে তার মন নেই। মা সুলোচনার মনে হয়-

> এই সব কোন কাজেই চন্দার মন নাই, করতে হয় করে। তার মন যে কোন সুদুরে ঘুরে, সুলোচনা তার নাগাল পায় না।[১১]

চন্দা ভাবে, বাবার মত সেও পালাগান গাইবে, মানুষ শুনবে। লিঙ্গ বৈষম্যময় নারী জীবনের নানা বাধা কষ্ট দেয় চন্দাকে-

> একই মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে ছেলেদের জগত আর মেয়েদের জগত কেন আলাদা হয়ে যায়?[১২]

এইভাবে চন্দার ভাবনায় লিঙ্গ প্রসঙ্গ যুক্ত হয়ে যায় উপন্যাসে, ইতিহাসে।

ফুল তুলতে গিয়ে চন্দার পরিচয় জয়ানন্দর সঙ্গে। জয়ানন্দের চিঠি পেয়ে তার দু চোখে ধারা বয়। একই পত্র বারবার পড়ে সে। কোনোদিন কি ভেবেছে তার ফুল তোলার সাথী জয়ানন্দের মনে এত বেদনা আছে? এতো ভালোবাসা আছে তার প্রতি? এই জয়ানন্দের সঙ্গেই আবার মাধব ঘটক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসে চন্দার বাড়িতে। বিয়েও ঠিক হয়। অন্যদিকে নাসির মিঁয়ার কাছে আরবি ফারসি পড়তে গিয়ে জয়ানন্দের পরিচয় হয় আসমানতারার সঙ্গে। তাকে সবাই বলে আসমানী। নদীর ঘাটে আসমানীকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে জয়ানন্দ-

> আসমানতারার চোখ ঝলসানো রূপের কাছে চন্দ্রাবতীর মাটির পরতিমা যেন দাঁড়াতেই পারল না।[১৩]

জয়ানন্দ ধর্মান্তরিত হয়ে যায়, জয়নাল নাম হয় তার। আশমানির সঙ্গে ঘর বাঁধে, অথচ চন্দাকে সে ভুলতে পারে না। জয়নালের বেদনা-অনুশোচনার সঙ্গে আশমানীর প্রেম বাসনার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। পরে আশমানী বুঝতে পারে, তার 'আব্বু' কাজী সোনাফরের জন্যই তার এই দুর্গতি-

> আসমানীর রূপের খ্যাতি পৌঁছেছিল, সেই রূপকেই কাজে লাগাতে চেয়েছে কাজী সুনাফর, সে তার আব্বু নয়, সে এক ক্ষমতালোভী কাজী। সে চেয়েছিল তার রূপের ফাঁদে হিন্দু যুবক জয়ানন্দকে ধরতে।...সেই তাদের কাছে টেনে সে দেখাতে চেয়েছে তার ক্ষমতা। চেয়েছে আর পেরেওছে। কিন্তু আসমানী মরল মাঝখান থেকে।...আসমানী হচ্ছে সেই উলুখাগড়া। মেয়েমানুষ মাত্রই তো উলুখাগড়া।[১৪]

পুরুষের ক্ষমতা জাহির করার পথে মেয়েদের পণ্যের মত ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত সমাজ-ইতিহাস থেকে তুলে এনে আখ্যানের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন তৃষ্ণা বসাক। জয়ানন্দের আশমানির প্রতি আসক্তিকে দেখানো হয়েছে একটি চক্রান্ত হিসেবে। আশমানিকে শুধু নিজেদের প্রয়োজনে ও উদ্দেশ্যপূরণের জন্য ব্যবহার করেছে সোনাফর। যেভাবে ব্যবহৃত হয় মেয়েরা অন্যের প্রয়োজনে কখনো খুব নিকট মানুষের উদ্দেশ্যসিদ্ধি বা ক্ষমতার লোভের কারণে। আশমানি জয়নালের সম্পর্ক ভেঙে যায়। চন্দাবতী আর জয়ানন্দের সম্পর্কও গড়ে ওঠে না। চন্দাবতী প্রবঞ্চক জয়ানন্দকে আর স্বীকার করতে চায় না। জয়ানন্দ আত্মহত্যা করে। চন্দাবতী সামাজিক বাধা কাটিয়ে 'কবি' হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

চার

তৃষ্ণা বসাকের 'জয়াবতীর জয়যাত্রা' উপন্যাসে রয়েছে জয়াবতী নামক এক কিশোরীর অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি। উপন্যাসের পটভূমি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। জয়াবতী একটি কল্পিত চরিত্র হলেও অষ্টাদশ শতকের সমাজে এমন মেয়ে হয়তো ছিল, যারা রামমোহন, বিদ্যাসাগরের পূর্বে অযৌক্তিক সংস্কার ও রীতিনীতি বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিল। সেই সময় সামান্য অক্ষর পরিচয় ছিল না, এমন মেয়েদের অসম্ভব মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখিকা তাঁর বাবার মুখে শুনেছিলেন-

> পিতৃকুলে অষ্টাদশ শতকে লক্ষী সরস্বতী নামে দুই মেয়ে ছিলেন, যাঁরা কাশী থেকে আসা এক বিখ্যাত পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন বলে তাঁদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাঁরা পরে নাকি কাশীতে টোল খুলে বসেন।[১৫]

ইতিহাস থেকে উঠে আসা এমন মেয়েদের গল্পই 'জয়াবতী'-র মত চরিত্রের জন্ম দিয়েছে। ইতিহাসে যার অস্তিত্ব অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এইসব তার্কিক, বুদ্ধিমতী, প্রতিবাদী মেয়েদের কথা পুরুষতান্ত্রিক বয়ানে ঢাকা পড়ে গেছে। ইতিহাসের অন্তরালে থেকে গেছে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দীর্ঘ সময় ধরে মেয়েদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে রাখা হত। মনে করা হত, পড়াশোনা করলে মেয়েদের বিধবা হতে হবে। এ ধরনের অন্ধ কুসংস্কার অনেকদিন ধরে সমাজে প্রচলিত ছিল। উপন্যাসের শুরুর দিকে সেই সময়ের একটি সমাজচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বোলসিদ্ধি গ্রামের ন্যায়রত্ন পরিবারের বংশে জন্মগ্রহণ করা দুই নারী লক্ষ্মী ও সরস্বতী কাশীর এক পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দেওয়ায় 'মেয়েমানুষের এত বাড়'-এর শাস্তিস্বরূপ তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং তারপর থেকে সেই পরিবারে মেয়েদের অক্ষর পরিচয় করানোই বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই পরিবারেরই মেয়ে জয়াবতী, বোলসিদ্ধি গ্রামের পণ্ডিত কালীগতি ন্যায়রত্নের কন্যা। সে সমস্ত সামাজিক বিধিনিষেধ অতিক্রম করতে উদ্যোগী। সে ও তার বাল্যবিধবা সই পুণ্যি নানাবিধ প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ভিষক পুথি পড়ে জঙ্গল থেকে ভেষজ ওষুধ সংগ্রহ করে এনে তার বাবা, মা ও রাঁধুনির জ্বর হারিয়ে তোলে। জয়াবতীর এই প্রতিভা দেখে পিতা কালীগতি জয়াবতীকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে পাঠান তিনটি গ্রাম দূরে সোনাটিকরি গ্রামের বৈদ্য দীননাথ সেনের কাছে। চিকিৎসাবিদ্যা শেখার পাশাপাশি সেখানে জয়াবতী ঘোড়ায় চড়া, লাঠি খেলা ইত্যাদিও শিখে নেয়। মেয়েরা যে কেবল শাড়ি পরে ঘরের কাজ করে তা নয়, শাড়ি পরে যুদ্ধও করে, তা শোনা যায় বৈদ্য দীননাথ সেনের বক্তব্যে-

> শাড়ি পরে যুদ্ধ করে কিন্তু এ দেশের মেয়েরা। তারা মারাঠা জাত। ঘরও সামলায়, আবার ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে। তারা ধুতির মতো মালকোঁচা মেরে শাড়ি পরে।[১৬]

দীর্ঘদিন ধরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছে। তাদেরকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু স্বাধীনচেতা মেয়েরা বরাবর এই গণ্ডি ভাঙতে চেয়েছে। এ উপন্যাসে উঠে এসেছে সেই বন্ধনমুক্তির প্রসঙ্গ, যেখানে বলা হয়েছে মেয়েরা ঘরের কাজ এবং বাইরের কাজে সমান পারদর্শী। কেবল তাই নয়, এখানে বর্ণিত হয়েছে অন্ধ সংস্কার ও রীতিনীতি ভেঙে ফেলার প্রসঙ্গ। জয়াবতীর বাল্যবিধবা সই পুণ্যি একাদশী পালন করলে জয়াবতী তাকে নিষেধ করে এবং তার কারণ হিসাবে এটিকে এক অন্ধ সংস্কার ও পুরুষতান্ত্রিকতার নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করে-

> .... তুই ভেবে দেক আমাদের পাশের বাড়ির রাজু খুড়ো, খুড়িমা মরে গেল আগের ভাদ্দরে, দেকেছিস কোনোদিন একাদশী করতে? উলটে রোজ দেখবি হারান ঘটক ছাতি বগলে আসচে, পুজোর সময় গিয়ে দেখবি তার বে হয়ে গেচে, তারপর ধর কামারপাড়ার সতু কামাল...
>
> পুণ্যি কান্না থামিয়ে বলে, "তুই কোন দেশে থাকিস বল দিকি? কে কবে শুনেচে পুরুষমানুষ বউ মরলে আলোচনার আর কাঁচকলা খায়?"
>
> "কেন পুরুষমানুষ বলে কি মাথা কিনে নিয়েচে? ওদের দুটো পা, দুটো হাত, দুটো চোখ, দুটো কান আর সবচে বড়ো কতা একটাই মাতা ঘাড়ের ওপর, মেয়েমানুষ তো আরও

> বেশি। মেয়েমানুষের পেট থেকেই তো পুরুষমানুষ জন্মায়। কোনোকালে শুনেছিস পুরুষের পেট থেকে মেয়েমানুষ জন্মেছে?"[১৭]

জয়াবতী এ উপন্যাসে সামাজিক আগল ভাঙার প্রতীক, সংস্কার ছিন্ন করার প্রতীক। সে নিজের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সতী হতে চলা এক নারীকে উদ্ধার করে। বুদ্ধিমতী ও যুক্তিবাদী জয়াবতী এও বুঝতে পেরেছিল, আফিম খাইয়ে মেয়েটিকে কার্যত বেঁহুশ করে বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে সহমরণে পাঠানো হচ্ছে। জয়াবতী লাঠি ঘুরিয়ে বীরত্ব দেখিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করে এবং তার নামকরণ করে পেরজাপতি অর্থাৎ প্রজাপতি, কারণ "ওকে কেউ ধরতে পারবে নে, ও কেবল উড়ে উড়ে বেড়াবে!"[১৮] যে সমাজ মেয়েদের সবসময় ঘরবন্দি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখতে চায়, সেখানে জয়াবতীর গলায় শোনা যায় মেয়েদের স্বাধীনতার বাণী, বন্ধনমুক্তির বাণী। সতীদাহ প্রথা ও বহুবিবাহের মত নৃশংস ও অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে জয়াবতী শাণিয়ে তোলে তীব্র প্রতিবাদ। চিতার আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসা পেরজাপতিকে গম্ভীর হয়ে থাকার পরিবর্তে প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠার পরামর্শ দেয় জয়াবতী-

> মরে যাই, মরে যাই! ভারী আমার সোয়ামি রে। গেছে গেছে, আপদ গেছে। আশি বছরের বুড়ো একটা। পঞ্চাশ-একশোটা বিয়ে ছিল। তাছাড়া চিতার আগুনে তো পুড়তে হয়নি শেষ অবধি, আমরা তো গিয়েই পড়লুম। তাই বলে কি মুখখানা তোলো হাঁড়ি করে থাকতে হবে? শাস্তরে কী লিখেছে জানিস তো, মরার আগে মরার চিন্তা করলে পাপ হয়।[১৯]

'জয়াবতীর জয়যাত্রা' উপন্যাসটি আসলে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও অন্ধ সংস্কারের বিপরীতে এক স্বাধীনচেতা মেয়ের লড়াইয়ের কাহিনি। উপন্যাস জুড়ে কিশোরী জয়াবতী সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে নিজস্ব বিচারবোধ ও যুক্তিবোধকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছে। চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যেখানে মেয়েদের বারবার আটকে রাখতে চেয়েছে, নানা বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছে, জয়াবতী সেখানে এক ব্যতিক্রমী নারী, যে সবসময় চেয়েছে অন্ধ সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে আসতে। জয়াবতীর বাচনভঙ্গিতে মুগ্ধ জমিদারও তাই তাঁর দীর্ঘদিনের সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবেন-

> আজ প্রথম তার মনে হল, সমাজে কত কথাই এমন চলে আসছে, কখনও তাদের খতিয়ে দেখা হয় না। বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে কথাগুলো-
> -মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়।
> -মেয়ে হল পরের ধন।
> -পথি নারী বিবর্জিতা।
> আর ওই বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না! আসলে যাদের কথা বললেই চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে চিরকাল, তারা কখন যেন বোবা হয়ে গেছে। আজ তাঁর প্রথম মনে হল মেয়েদের কথা না বলতে দিয়ে জীবন থেকে কত কী হারিয়ে ফেলেছেন।[২০]

আর এভাবেই 'জয়াবতীর জয়যাত্রা' উপন্যাসটি হয়ে ওঠে অষ্টাদশ শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গদেশে আলোকবর্তিকা বহন করে নিয়ে যাওয়া একটি মুক্তমন মেয়ের কাহিনি, যে অন্ধ সংস্কারে ভরা সমাজের বদ্ধ জলার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চলার দুঃসাহস দেখাতে পেরেছিল।

পাঁচ

শান্তা মুখোপাধ্যায়ের 'মল্লমাধুরী' (২০২৩) উপন্যাসটি ষোড়শ শতাব্দীর মল্লভূমের লোকজ সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপর নির্ভর করে লেখা। রাজা হাম্বিরমল্লের রাজসভা ও অন্তঃপুর, রানি সুদেষ্ণা , রাজকন্যা মাধুরী, মন্ত্রী মাধবাচার্য, ব্যাসপণ্ডিত প্রমুখ চরিত্র নিয়ে ইতিহাস কথা বলে উঠেছে এখানে। রাজা হাম্বিরমল্ল

আচার্য শ্রীনিবাসের বৈষ্ণবীয় ভক্তির ছোঁয়ায় বদলে যেতে থাকেন। প্রশ্ন তোলেন নানা কুপ্রথা এমনকি সতীদাহের প্রসঙ্গেও। লিঙ্গ ভাবনা টুকরো টুকরো অনুষঙ্গে যুক্ত হতে থাকে ইতিহাসের সঙ্গে। শবরীদের মত প্রান্তিক মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য লাঠিখেলা শেখার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। নারী সুদেষ্ণা ভেবেছেন রাজনীতিতে উত্থান-পতন অনিবার্য। রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের সময় মেয়েরাই বেশি আক্রান্ত হয় তাই তাদের আত্মরক্ষার কৌশল জানা জরুরি। উপন্যাসটিকে শবরী মা তার মেয়েকে লাঠি খেলা শেখায়। সেই সময়ের একশ্রেণির মহিলাদের বৃত্তি ছিল রাজ অন্তঃপুরে বা অভিজাত গৃহের মহিলা মহলে নানা ধরনের গল্প শোনানো। এটা ছিল অন্তঃপুরের জীবনে এক বিনোদন। গল্পে গল্পে মেয়েরা অচিনপুরে মানস ভ্রমণ করে আসত। এই বৃত্তিজীবী নারীদের বলা হত আলাপনী। রাজা ও অভিজাত মানুষেরা কখনো তাদের মাসিক বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন।

> আলাপনী রাজসদর থেকে বার্ষিক বৃত্তি পায়। তাই তাদের দৈনিক পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।[২১]

রাম-সীতার কথা থেকে মনসার পাঁচালী, আঞ্চলিক লোককথা তাদের কথায় কথায় গাঁথা হয়ে যেত। এভাবে মেয়েরা তাদের সৃজনশীলতার জগৎ মৌখিক পরম্পরার মাধ্যমে তৈরি করেছিল। মেয়েদের সৃষ্টিশীলতা কথায়, গানে, গৃহকর্মের খুঁটিনাটির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে গাঁথা হয়ে চলেছিল। উপন্যাসটি এই লিঙ্গ পরিসর তৈরি করে। রাজকুমারী চন্দ্রলেখার বাল্যবিবাহ, বিবাহের পরই সন্তান ধারণ, স্বামীর নিষ্পেষণ, সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মৃত্যু সেই সময়ের মেয়েদের অসহায়তাকে বুঝিয়ে দেয়। গর্ভবতী চন্দ্রলেখার ভাবনায় সেই নির্যাতনের সার্বিক স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে-

> চন্দ্রলেখা কি বলবে? ভালোবাসা কাকে বলে? শরীর নারী হয়ে ওঠার আগেই সম্ভোগে? ব্যাথাতুর রতিক্রিয়ায়? সে রাজার মেয়ে হও আর যেই হও! স্বামী স্ত্রীর অধিকারের সম্পত্তি।[২২]

বৈবাহিক সম্পর্কে যৌন নির্যাতনের শিকার চন্দ্রলেখা। সে রাজার মেয়ে। কিন্তু তার লিঙ্গ পরিচয়ের কাছে শ্রেণি পরিচয় গৌণ হয়ে গেছে। বাল্যবিবাহের ফলে অসম দাম্পত্য, যন্ত্রণাময় সম্ভোগ নারী জীবনকে বিড়ম্বিত করেছে বহুদিন থেকে। আখ্যান লিঙ্গগত ইতিহাসের সেই বাস্তবতাকেই ধারণ করে আছে।

ছয়

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ‘বেনেবউ’ উপন্যাসে দেখিয়েছিলেন ষষ্ঠ শতকের বঙ্গদেশের গ্রামীণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অন্ধ কুসংস্কার ও বহুবিবাহের কারণে নারী জীবনে বিড়ম্বনা। মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডে যে আখ্যান নির্মাণ করেছিলেন, সেই ইতিহাস মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে এক লৈঙ্গিক অভিমুখ তৈরি করেছিল। বিশ শতক পেরিয়ে এসে ইতিহাসে সেই উপেক্ষিত অভিমুখকে আখ্যানে গড়ে তোলার নানা আয়োজনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

নারীকে পারিবারিক অবস্থানে, আদর্শায়িতভাবে ইতিহাস নির্মাণ করে, সংস্কৃতি ধারণ করে। রক্ষণশীল মানসিকতার গণ্ডি পেরিয়ে সেই চিত্রায়ণ গ্রহণযোগ্যতা পায় না। দীর্ঘদিনের এই সামাজিক অভ্যাস অনেকটা ব্যাধির মত, যেখানে একটি লিঙ্গ শ্রেণির মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয়কে ধারণ করা হয় না। সাম্প্রতিক আখ্যানে সেই পরিসর অনেকটাই তৈরি হয়েছে, যেখানে ইতিহাসের সম্ভাবনাগুলি পুনর্বিবেচিত হচ্ছে। নারীদের সামাজিক অবদমনের ইতিহাসে আলো ফেলা চলেছে।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখায়-

> এখনো আমরা একই সঙ্গে বিংশ শতকে ও অন্যান্য বিগত শতকে বাস করি। যে জন্য ভারতীয় সমাজে কোন ব্যতিক্রমী মহিলার কথা জানলে তাঁকে উচ্চালোচিত করা উচিত।[২৩]

এখনও আমাদের সমাজের একটা অংশ অনগ্রসর, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রক্ষণশীলতাকে ধারণ করে থাকে। এখনও অনেকেরই মানসিক স্থিতি বিগত শতকের লিঙ্গবৈষম্যের অন্ধকারে তলিয়ে আছে। তাই ইতিহাসে মহিলাদের ব্যতিক্রমী ভূমিকা আখ্যানের মধ্যে দিয়ে উজ্জীবন শুধু ইতিহাস নির্মাণই নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতাও। মোহনা, মাধবী, চন্দাবতী, জয়াবতীরা এমনই ব্যতিক্রমী মহিলা, যারা উপনিবেশ পূর্ব বাংলার ইতিহাস পরিসর থেকে উঠে এসে সমাজ নির্ধারিত লিঙ্গ ভূমিকার বাইরে চলে এসেছে। যাদের চিন্তা, চেতনা ও কাজের মধ্যে দিয়ে প্রথাগত ইতিহাসচর্চা চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়েছে।

ঔপনিবেশিক কালপর্বের আগে বঙ্গদেশের মেয়েদের শৌর্য বীর্যের প্রতিশ্রুতি এক ভিন্ন ইতিহাসের দরজা খুলে দেয়, যা উপনিবেশ নিয়ন্ত্রিত ইতিহাসচর্চার বাইরেই থেকে গিয়েছিল। উত্তর-ঔপনিবেশিক আয়নায়, আখ্যানে নিবদ্ধ লৈঙ্গিক ইতিহাস সেই বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া উপেক্ষিত ভাষ্য।

তথ্যসূত্র:

১. Geoff Eley and Keith Nield, 'The Future of Class in History: What's left of the Social', University of Michigan Press, 2007, p. 68.
২. জলদাস, হরিশংকর। 'মোহনা'। ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ১২৮।
৩. রায়, নীহাররঞ্জন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য- 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'। দেজ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২০, পৃ. ৪৬৫।
৪. তদেব, পৃ. ১৪।
৫. রায়, নীহাররঞ্জন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য- 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'। দেজ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২০, পৃ. ৪০৭।
৬. সেন, সুকুমার (সম্পা.)। 'সেকশুভোদয়া'। আর.এন. শীল কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, পৃ. ১৯।
৭. চক্রবর্তী, রজনীকান্ত। 'গৌড়ের ইতিহাস'। দেজ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১২৪।
৮. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। 'রাজসভায় মাধবী', 'কবিতাসমগ্র ৩'। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ১৫৯।
৯. বসাক, তৃষ্ণা। 'চন্দাবতী'। একুশ শতক, কলকাতা, এপ্রিল ২০২৩, পৃ. ৯।
১০. তদেব, পৃ. ৯৩।
১১. তদেব, পৃ. ৪৪।
১২. তদেব, পৃ. ২৮।
১৩. তদেব, পৃ. ৭০।
১৪. তদেব, পৃ. ১৫৪।
১৫. তৃষ্ণা বসাক, 'জয়াবতীর জয়যাত্রা', কলকাতা, সৃষ্টিসুখ, ২০২৩, ভূমিকা।
১৬. তদেব, পৃ. ২৪।
১৭. তদেব, পৃ. ৩০।
১৮. তদেব, পৃ. ৪৩।

১৯. তদেব, পৃ. ৪৯।
২০. তদেব, পৃ. ১০১-১০২।
২১. শান্তা মুখোপাধ্যায়, 'মল্লমাধুরী', কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, ২০২৩, পৃ. ৪৯।
২২. তদেব, পৃ. ১১৭।
২৩. মহাশ্বেতা দেবী, 'বেনেবউ', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ১।